গত বছর গ্লাসগো-তে প্রধানমন্ত্রীর চমকপ্রদ ঘোষণা, ভারত নেট জিরো লক্ষ্যে পৌঁছবে ২০৭০-এর দশকে

মহৎ প্রতিশ্রুতি বনাম বাস্তবের হিসেবনিকেশ

কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য কার্যক্ষেত্রে যে সব পদক্ষেপ করা দরকার, তা এখনও দৃশ্যমান নয়। অতএব লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো নিয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট। লিখছেন দীপায়ন দে

বিসিসিএল

সাধারণ মানুষের কাছে জলবায়ু পরিবর্তন খানিকটা 'অন্ধের হস্তিদর্শন'-এর মতো। কখনও তা মনে হয় ঝড়-ঝঞ্ঝা সাইক্লোন, কখনও বা অতিমারী অথবা কখনও খরা আর বন্যা। মানবসভ্যতা আসলে এখন দুই তুষার যুগের অন্তর্বর্তী দীর্ঘতম 'ইন্টারগ্লেসিয়াল পিরিয়ড'-এ বসে প্রচেষ্টা করছে মনুষ্যসৃষ্ট কার্বন নির্গমনকে নিয়ন্ত্রণে এনে বিশ্বের তাপমান ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধে রাখতে। কিন্তু সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রস্তাবিত নীতিমালা নিয়ে বেধেছে বিস্তর বিতর্ক। প্রথমত অর্থনীতি এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে কী করে প্রতিটি দেশের কার্বন নির্গমন মাত্রাকে সর্বসম্মত এবং অভিন্ন সম্ভাবনাসূচকে ফেলা যায় এবং দ্বিতীয়ত নির্গমন হ্রাস করার উপযুক্ত প্রযুক্তি বা প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তার আনুপাতিক বিনিয়োগের দায়দায়িত্ব উন্নত দেশগুলোর হবে না কেন? এই সমাধান সূত্র খুঁজতে গিয়ে তৈরি হয়েছিল 'কিয়োটো প্রোটোকল', এবং ২০১৫-য় তৈরি হোলো 'প্যারিস এগ্রিমেন্ট'। তত দিনে বিশ্ব অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে 'কার্বন ডলার' অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব বিমোচনে প্রশমন (মিটিগেশন) এবং অভিযোজনের (অ্যাডাপ্টেশন) প্রযুক্তি তৈরি এবং কেনাবেচা, ক্ষয়ক্ষতির হিসেবনিকেশ এবং অর্থের বিনিময়ে কার্বন প্রশমনের কৃতিত্ব (কার্বন ক্রেডিট) কেনার হিড়িক। পরপর জলবায়ু সম্মেলন অসফল হওয়ায় আন্তরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন পর্ষদের (আইপিসিসি) ষষ্ঠ প্রতিবেদনে তখন আবার জোর দেওয়া হয় 'নেট জিরো'র ওপরে।

নেট জিরো কী?

'নেট-জিরো' একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূলতাকে অনেকাংশেই প্রতিহত করতে পারবে এবং ২০৩০ সালের ভেতর মনুষ্যসৃষ্ট কার্বন নিঃসরণের মাত্রা ২০১০ সালের তুলনায় ৪৫ শতাংশ কমিয়ে আনবে যাতে আগামী ২০৫০ সালে সেই নিঃসরণের মাত্রা শূন্যে গিয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব উষ্ণায়ন ক্রমবর্ধমান কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের সমানুপাতিক, অর্থাৎ যতক্ষণ বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন শূন্যের উপরে থাকবে ততক্ষণ জলবায়ু পরিবর্তন-জনিত ক্ষতিও বাড়তে থাকবে। 'নেট জিরো' সেই শূন্য-অবস্থা যা পেতে হলে, হয় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে, অথবা নিশ্চিত করতে হবে যাতে অন্য কোনও চালু প্রকল্পে কার্বন নির্গমন অপসারণের মাধ্যমে তার ভারসাম্য বজায় থাকে। সোজা কথায়, আমরা যতটা কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা তুলামূল্যের গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করি, ঠিক ততটাই যদি অপসৃত করতে পারি তা হলে নির্গমন মাত্রা সেই শূন্য-অবস্থায় পৌঁছাতে পারে।

নেট কেন?

'নেট-জিরো'তে 'নেট' শব্দটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমস্ত নির্গমনকে শূন্যে কমানো খুব কঠিন। পাশাপাশি নির্গমনে ব্যাপক হ্রাস অর্থনৈতিক ভারসাম্যকেও ব্যাহত করতে পারে, তাই সম্ভাব্য অপসারণের পরিমাণ স্থায়ী ভাবে বাড়াতে হবে। স্থায়ী বা 'হার্ড নেট জিরো' বলতে বোঝায় সমস্ত গ্রিনহাউস গ্যাসের সিঙ্ক বা আধার এবং তার উৎসের মধ্যে একটি 'ভারসাম্য'। এর অর্থ হ'ল, গ্রিনহাউস গ্যাস যেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে ফিরে না আসে, নিয়তই যা ঘটে বন ধ্বংস বা অনুপযুক্ত কার্বন সঞ্চয়ের মাধ্যমে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অনেক দেশই হয়তো 'নির্ঘুত শূন্য' (অ্যাবসোল্যুট জিরো) বা শূন্য নির্গমন (জিরো এমিশন) অর্জন করতে সক্ষম হবে, তাই সবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়েই বিশ্বব্যাপী 'রেস টু জিরো' অভিযান শুরু হয়েছে। আর এই দৌড়ে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের দেশ, ভারত। কিন্তু কেন, সে কথায় আসছি।

সময়সীমা ২০৭০

২০২২-এ সবচেয়ে বড় দূষণকারী দেশগুলোর মধ্যে চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয় ইউনিয়ন সহ ৭০টিরও বেশি দেশ একটা 'নেট-জিরো' লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যা বিশ্বব্যাপী নির্গমনের প্রায় ৭৬ শতাংশ নির্গমন প্রশমন করবে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ভারত অবশ্য প্রথম থেকেই 'নেট-জিরো' নীতির বিরোধী, কারণ ভারত কার্বন নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশ্বের তৃতীয় দেশ হয়েও মাথাপিছু কার্বন নির্গমন মানদণ্ডে ছিল অনেক নিচে এবং আমাদের অভিমত ছিল যে অন্যান্য উন্নত দেশগুলি যাদের মাথাপিছু নির্গমনের হার অনেক বেশি তারা আগে সেই কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করে দেখাক। কিন্তু ২০২১-এর গ্লাসগো অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি সবাইকে চমকে দিয়ে জানাল, ভারত তার 'নেট-জিরো' লক্ষ্য পৌঁছাবে ২০৭০-এর দশকে। এই অধিবেশনে ভারত একটি পাঁচ-দফা জলবায়ু কর্মপরিকল্পনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যার অন্তর্গত অ-জীবাশ্ম জ্বালানি শক্তির ক্ষমতা বাড়িয়ে ৫০০ গিগাওয়াট করা, নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে চাহিদার ৫০ শতাংশ মেটানো, এক বিলিয়ন টন কার্বন নিঃসরণ কমানো। এ ছাড়াও ছিল ২০৩০-এর মধ্যেই অর্থনৈতিক কার্বন তরতা (ইকোনমিক কার্বন ইন্টেন্সিটি) ৪৫ শতাংশের নীচে নামিয়ে আনার প্রস্তাব। এই কর্মপরিকল্পনায় যে ক্ষেত্রগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা হল শক্তি, পরিবহণ এবং পরিকাঠামো, কারণ মোট গ্রিনহাউস গ্যাসের ৫৮ শতাংশ উৎসারিত হয় এই ক্ষেত্রেই। এই চমকপ্রদ প্রস্তাবের আড়ালে অন্তর্নিহিত ছিল দু'টি বিষয়, যা একে অপরের পরিপূরকও বটে। প্রথমত কার্বন বিনিয়োগের স্রোতকে ভারতমুখী করা যাতে নবায়নযোগ্য শক্তি-প্রযুক্তি এবং বৈদ্যুতিন পরিবহণ ব্যবসা ভারতের নাগালে থাকে এবং দ্বিতীয়ত এশিয়া মহাদেশে চিনের আধিপত্য খর্ব করা, কারণ চায়না বৃহত্তম নির্গমনকারী দেশ হয়েও, 'নেট-জিরো' প্রতিশ্রুতি প্রদানে তখনও বিরত ছিল। আর একটা জয়ও লুকানো ছিলো এতে, সেটা হল কৃষি এবং কৃষকদের এর আওতার বাইরে রেখে এবং নগরায়নকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দাটুকু গুছিয়ে নেওয়া।

এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০৭০ নেট-জিরো লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রয়োজন প্রায় দশ লক্ষ কোটি ডলার, এই বিনিয়োগের ফলে ২০৩৬-এ ভারতের জিডিপি ৪.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

আশাজনক প্রতিশ্রুতি

সম্প্রতি এশিয়া সোসাইটি পলিসি ইনস্টিটিউট যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে যে এই ২০৭০ নেট-জিরো লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারতের প্রয়োজন প্রায় দশ লক্ষ কোটি ডলার, এই বিনিয়োগের ফলে ২০৩৬-এ ভারতের জিডিপি ৪.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ১৫০ লক্ষ কর্মসংস্থান বাড়বে। তবে ২০৩০-এ ভারতের কার্বন নির্গমনের হার হবে বিশ্বে সবচাইতে বেশি এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশমনের খরচ বাড়বে প্রায় ৬৭ শতাংশ। ২৭তম জলবায়ু সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি এই সবুজ নবদিগন্তের ইঙ্গিত দিয়েছিলো। এ বছর ৩ অগস্ট, সংসদের ছাড়পত্র পাওয়ার পরে তা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে হল। মনে হল, ভারত আবার জগত সভার শ্রেষ্ঠ আসনটিতে উপবেশন করতেই পারে যদি এই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ফস্কে না যায় হাত থেকে। ফস্কাতে পারে কি? সেটাই আলোচ্য বিষয়।

হতাশাজনক বাস্তব

প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই জাপানি কাইজেন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন যাতে ক্রমাগত উন্নতর মাধ্যমে 'ন্যায্য রূপান্তর' (জাস্ট ট্রানজিশন) কায়েম করা যায়। এই 'ন্যায্য রূপান্তর' ছোট ছোট ধারণা এবং বহমান ইতিবাচক পরিবর্তনগুলিকে একত্র করে গড়া যাতে সমতার নিরিখে কাউকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এ দেশে জীবন-জীবিকার ক্ষয়ক্ষতি পূরণে ন্যায়বিচারের পরিবর্তে আইনানুগ অস্বিকারকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে রাষ্ট্রের 'বৃহত্তর স্বার্থে' তা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ (বা অস্বীকার) করা যেতে পারে। এহেন অবস্থায় 'ন্যায্য রূপান্তর' যেন প্রহসন বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত বলি, নেট-জিরো প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে দরিদ্র এবং দুর্বলদের রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বপোষিত জীবনধারা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তখন এই 'ন্যায্য রূপান্তর'কে রূপায়িত করতে নিশ্চয়ই জনসাধারণের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার কথাও ভাবা হয়েছে, না হলে তারা সেই উদ্যোগ নেবেই বা কি ভাবে? কিন্তু গণশিক্ষা এবং গণসচেতনতার কোনও কর্মপরিকল্পনা 'নেট-জিরো' বিধানে খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হবে, যেমন অনুপস্থিত দেখি রসদ পুনর্নবীকরণ বা পুনর্নির্মাণের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের কথা। ২০৭০-এর 'নেট-জিরো' যার উপর ভর করে আছে তার মধ্যে একটা অবশ্যই সামগ্রিক উন্নয়ন, যেখানে নগরোন্নয়ন, শক্তি, পরিবহণ, পরিকাঠামো ছাড়াও অপরিহার্য ভাবে নজর দিতে হবে গ্রান্তিক জনগোষ্ঠী, জীববৈচিত্র এবং গ্রামোন্নয়নের মতো বিষয়গুলিতে। ভাবতে হবে জলাভূমি সংরক্ষণের কথা। মনে রাখতে হবে, লক্ষ্য ২০৩০ বা ২০৫০ কিংবা ২০৭০ যা-ই হোক না কেন, প্রকৃতি কিন্তু তার ক্যালেন্ডার মেনেই চলবে। সেখানে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। আর থেকে গেল কিছু অঘৈ দুশ্চিন্তা, যেমন, কৃষিক্ষেত্রে সৌরশক্তি-চালিত পাম্পের যথেচ্ছাচারে ফুরিয়ে যাবে না তো মাটির নীচের সব জল, ঠিক যেমনটা ঘটেছে পাঞ্জাব হরিয়ানায়? ভূয়ো সবুজায়নের আড়ালে নিশ্চিহ্ন হবে না তো বনাঞ্চল, ঠিক যেমনটা ঘটছে ২০২২-এর নতুন বনভূমি সংরক্ষণ আইনে? অথবা কার্বন গণনার পদ্ধতিতে জল ঢালবে না তো 'গ্রিন ওয়াশিং' ঠিক যেমনটা দেখি সবুজ কাগজের মোড়কে বায়ুদূষণের বিষ বিক্রি হতে, 'সবুজ বাজি' বলে? আর তা-ই যদি হয়, তা হলে ২০৭০-এ সাধারণ মানুষরা দেখব যে কুড়িয়ে পাওয়া মানিব্যাগটা আর কিছুই না, ট্রাম গাড়ি চাপা পড়া চ্যাপ্টা ব্যাঙটা।

লেখক সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর এনভায়রনমেন্ট-এ রিসার্চ ও প্ল্যানিং বিভাগের প্রধান